অন্যান্য আলাপ

[সা ক্ষা ৎ কা র]

অন্যান্য আলাপ

বিদেশি লেখক-বুদ্ধিজীবীর সাক্ষাৎকার

রা জু আ লা উ দ্দি ন

বেঙ্গলবুকস

প্র কা শ ক
মাহমুদুল হাসান
বেঙ্গলবুকস

নোভা টাওয়ার, ২/১ নয়া পল্টন, ঢাকা ১০০০
বিশাল বুক কমপ্লেক্স, ৩৭ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : +88 01958519882, +88 01958519883

পরিবেশক : কিন্ডারবুকস, বেঙ্গলবুকস

বইটির কোনো অংশ বা সম্পূর্ণ বই কম্পোজ বা ফটোকপি আকারে বিক্রয় বা সরবরাহ অবৈধ। এ বইয়ের কোনো লেখা বা চিত্র হুবহু, পরিমার্জন বা পরিবর্ধন করে ছাপানো, এমনকি কোনো ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা কপিরাইট আইন, ২০২৩ অনুযায়ী দণ্ডনীয়।

ISBN : 978-984-99064-5-2

www.bengalbooks.com.bd
email : info@bengalbooks.com.bd

অ ন্যা ন্য আ লা প
বিদেশি লেখক-বুদ্ধিজীবীর সাক্ষাৎকার
রাজু আলাউদ্দিন

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৪৩২, এপ্রিল ২০২৫
কপিরাইট © রাজু আলাউদ্দিন
প্রচ্ছদ ও বইনকশা : আজহার ফরহাদ
বর্ণবিন্যাস ও কম্পিউটার গ্রাফিক্স : ক্রিয়েটিভ ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্ট
মুদ্রণ : কমলা প্রিন্টার্স, ৪১ তোপখানা রোড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
অনলাইন ডিস্ট্রিবিউটর : রকমারি ডট কম, বাতিঘর ডট কম
ভারতে পরিবেশক : ধ্যানবিন্দু, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা
যুক্তরাজ্য পরিবেশক : সংগীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিকলেন, লন্ডন
যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশক : মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

মূল্য : ৩৫০ টাকা

Onnanno Aalap
by Razu Alauddin

First published in paperback in Bangladesh by BengalBooks in 2025
Text Copyright reserved by Razu Alauddin
Illustrations Copyright reserved by the Publisher

Printed and bound in Bangladesh

উ ৎ স র্গ

সাহিত্য ও শিল্পানুরাগী সম্পাদক
তৌফিক ইমরোজ খালিদী
যিনি বাংলাভাষী ও ইংরেজিভাষী বহু কবির কবিতা
সমান স্বাচ্ছন্দ্যে স্মৃতি থেকে অনর্গল বলে যেতে পারেন

সূচনা কথা

অংশত পেশা সূত্রে, কখনো সাহিত্যিক কারণে, কখনোবা নিতান্ত কৌতূহলবশত এই গ্রন্থের সাক্ষাৎকারগুলো গৃহীত হয়েছিল ১৯৯৬ সাল থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে। ভাষিক ও জাতিগত বৈচিত্র্যের পাশাপাশি সাক্ষাৎকারদাতাদের জীবন ও পেশাগত অনুশীলনের নির্যাস ও অভিজ্ঞতা এ গ্রন্থের প্রধান বৈশিষ্ট্য। আমার কাজ ছিল সামান্যই : তাদের পেশার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোকে সামনে তুলে ধরা। স্প্যানিশ ছাড়া বাংলাভাষী সাক্ষাৎকারগুলোর কয়েকটি শ্রুতি থেকে লিপিরূপ তৈরি করেছেন কথাসাহিত্যিক অলাত এহসান। জ্যাক হার্শম্যানের সাক্ষাৎকারটি ইংরেজি শ্রুতি থেকে লেখ্যরূপ তৈরি করেছিলেন অনুবাদক ও সাংবাদিক রুহিনা ফেরদৌস এবং সেটির বাংলা তরজমা করেছিলেন প্রাবন্ধিক ও গবেষক শ্রদ্ধাভাজন পরাগ চৌধুরী। প্রাবন্ধিক ও গবেষক মারিয়া এলেনা বাররেরার সাক্ষাৎকারটির বাংলা তরজমা করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের সোহিনী দাশ। গ্রন্থাকারে প্রকাশের মুহূর্তে আন্তরিক সহযোগিতার জন্য তাদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই।

সাক্ষাৎকারগুলো যে গ্রন্থাকারে প্রকাশের সুযোগ পেল, এর মূল কৃতিত্ব তরুণ ভাবুক ও লেখক আজহার ফরহাদের। তার আগ্রহ ও আন্তরিকতাকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি। আর গ্রন্থের সার্বিক তত্ত্বাবধানে জড়িত নেপথ্যের কুশীলব তরুণ কবি আরিফুল হাসানের কথাও এই সূত্রে স্মরণ করছি। বইটি নির্ভুল ও নান্দনিক করার ক্ষেত্রে তার নিষ্ঠা ও আন্তরিকতাকে সাধুবাদ জানাই।

বলা বাহুল্য, বইটি পাঠকপ্রিয় হলে খুশি হব।

রাজু আলাউদ্দিন

বসুন্ধরা, ঢাকা

আ লা প ক্র ম

ভা র ত..

এখন তো অনেক শিল্পী বেরিয়েছে, মডার্ন সিঙ্গার আছে, পপ সিঙ্গার আছে, মেশিনও তো এখন সিঙ্গার হয়ে গেছে ১১
- **ওস্তাদ আল্লারাখা**

কোরআন শরিফে উটের উল্লেখ আছে, একাধিকবারই আছে ২১
- **শঙ্খ ঘোষ**

বাংলা সমালোচনা অনেকটা স্কুল-কলেজের সমালোচনা হয়ে দাঁড়িয়েছে ৩৭
- **শঙ্খ ঘোষ**

বাংলাদেশ তো আমার শিকড়ের দেশ ৫৯
- **অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত**

পশ্চিমবঙ্গ বলে একটা দেশ, যার কোনো পিতা নেই,
মাতা নেই, চরিত্র নেই, কিচ্ছু নেই ৬৮
- **ভূমেন্দ্র গুহ**

বাংলাদেশে যে বাংলাটা আদর্শ...সেই ভাষাটা হচ্ছে কলকাতার ভাষা ৯১
- **শিশিরকুমার দাশ**

ইউরোপ এই আদার কালচারকে সেভাবে কোনো দিনই দেখতে চায়নি ১২৯
- **শ্যামাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়**

ভারতবর্ষের ইউনিটিটা অনেক জোর করে বানানো ১৫৭
- **দিলীপ কুমার বসু**

উনি ইসলামকে অ্যাটাক করে, মোহাম্মদকে অ্যাটাক করে লিখেছিলেন ১৮০
- **শঙ্করলাল ভট্টাচার্য**

উপন্যাস করতে গেলে দরকার হবে ইতিহাসটা
একেবারে নির্মমভাবে তুলে আনা ১৯৯
- **শঙ্করলাল ভট্টাচার্য**

তসলিমার মধ্যে অনেক মিথ্যা ভাষণ আছে ২৩৩
• নন্দিতা বসু

মে হি কো ....

অক্তাবিও পাস : ভাবনা ও আবেগের সমাধানসহ
এক বিশ্বজনীন ব্যক্তিত্ব ২৫৮
• ব্রাউলিও পেরাল্‌তা

ঈশ্বরের সময় কখনোই মানুষের সময় নয় ২৭৬
• মেলবা প্রিয়া

ফ্রা ন্স ....

চিন্তাশীল মানুষ ও লেখকরা পরস্পরকে প্রভাবিত করেন ২৮৩
• আন মারি ওয়ালীউল্লাহ্‌

জা র্মা নি ....

ভারতকে চিনতে এখনো আমার বাকি আছে ২৯৬
• মার্টিন ক্যাম্পশেন

পো ল্যা ন্ড ....

অনুবাদের বদৌলতে বিশ্বসাহিত্য গড়ে ওঠে ৩১২
• এলজ্‌বিয়েতা ভালতের

যু ক্ত রা ষ্ট্র ....

আমি লেখি এবং পড়ি আমেরিকান সরকারকে
ক্রোধান্ধ করে দেওয়ার মতো কবিতা ৩৪২
• জ্যাক হার্শম্যান

এ কু য়া দ র ....

নজরুলকে এখনো ভালো করে বুঝে উঠতে পারিনি আমরা ৩৯৭
• মারিয়া এলেনা বাররেরা-আগারওয়াল

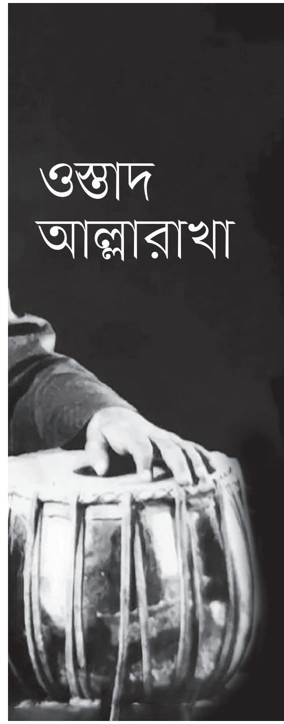

ওস্তাদ আল্লারাখা

এখন তো অনেক শিল্পী বেরিয়েছে,
মডার্ন সিঙ্গার আছে, পপ সিঙ্গার আছে,
মেশিনও তো এখন সিঙ্গার হয়ে গেছে

ওস্তাদ আল্লারাখা উচ্চাঙ্গসংগীতের জগতে জীবদ্দশায়ই কিংবদন্তি হয়ে উঠেছিলেন। জন্ম জম্মু-কাশ্মীরে ১৯১৯ সালে ২৯ এপ্রিলে। ২০০০ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি তিনি লোকান্তরিত হন। তাঁদের পরিবারে তিনিই প্রথম সংগীতজগতে প্রবেশ করেন এবং অল্প বয়সেই তিনি দেশে-বিদেশে তবলা বাজিয়ে সুনাম অর্জন করেন। ওস্তাদ হাফিজ আলী খাঁ, ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ এবং রবিশঙ্করসহ বিখ্যাত সব গুণী শিল্পীর সঙ্গে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠান করেছেন। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে বাংলাদেশের সাহায্যার্থে আমেরিকায় রবিশঙ্করের নেতৃত্বে যে অনুষ্ঠান হয়, তিনি সেই অনুষ্ঠানে তবলা বাজিয়েছিলেন। আল্লারাখার বাজনার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে রবিশঙ্কর বলেন, 'আল্লারাখার জাদুভরা হাতের কাহারওয়া, দাদরা বা চাচরের ঠেকা চলছে—ঠিক যেন কোনো নিপুণ প্রেমিক সুন্দরী নারীর গায়ে হাত বোলাচ্ছে। ...পাঞ্জাব ঘরের তো সমস্তই পেয়েছে, সেই সঙ্গে মিশিয়েছে ওর অদ্ভুত মাথা এবং হিসেব করার ক্ষমতা। নিজের প্রতিভার জোরে একটা নিজস্ব স্টাইল দাঁড় করিয়েছে ও। এখন ওর প্রভাব অনেক নবীন তবলিয়ার ওপর দেখা যায়।' ১৯৯৬ সালে সার্কের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগদান শেষে বাংলাদেশ ছাড়ার এক দিন আগে হোটেল সোনারগাঁওয়ে তাঁর সঙ্গে কিছু সময় আলাপ করার সুযোগ হয়েছিল। গম্ভীরদর্শী আল্লারাখাকে দেখে অনেকেরই ধারণা হতে পারে তিনি বুঝি মোটেই রসিক বা সদালাপী নন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আলাপ করার পর এই ধারণা ভুল বলেই প্রমাণিত হয়েছিল আমার। উল্লেখ্য, এই সাক্ষাতে কথাবার্তা হয়েছিল হিন্দিতে। হিন্দিতে আমার অপারগতার কারণে সংগীতজ্ঞ বন্ধু শহীদুজ্জামান স্বপনের সহায়তায় প্রশ্নগুলো করেছিলাম। তার দোভাষী ভূমিকার কারণেই সম্ভব হয়েছিল এই আলাপচারিতা। শহীদুজ্জামানের কাছে এ জন্য আমার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে রাখছি এই সুযোগে।

■ ***রাজু আলাউদ্দিন :*** *ওস্তাদজি, আপনি এই প্রথম বাংলাদেশে এলেন?*

ওস্তাদ আল্লারাখা : না, এর আগেও আমি একবার এসেছিলাম, ১৯৫৮ সালে।

■ *তখন তো পূর্ব পাকিস্তান ছিল।*

আল্লারাখা : বাংলাদেশ হওয়ার পর এই প্রথম। সেই সময় আমরা ঢাকা ও ময়মনসিংহে অনুষ্ঠান করেছিলাম। আমার সঙ্গে ছিলেন আলী আকবর খাঁ।

■ *ময়মনসিংহে দুজন গুণী শিল্পী সেই সময় ছিলেন, সেতারবাদক পণ্ডিত বিপীন দাস ও বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য। তাঁদের সঙ্গে আপনার আলাপ হয়েছিল কি?*

আল্লারাখা : অনেক আগের কথা। ওদের সঙ্গে দেখা হওয়ায় আমার খুব ভালো লেগেছিল। ৪০ বছর আগে আমি কলকাতায় এসেছিলাম, তখন সেখান থেকে ঢাকায় আসি। ঢাকায় যথেষ্ট সংগীতবোদ্ধা এবং সমঝদার শ্রোতা পেয়েছিলাম। এখানে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের ভাই ওস্তাদ আয়েত আলী খাঁ আদর-যত্ন করেছিল। আয়েত আলী খাঁ বাংলাদেশের সংগীতের অলংকার। বাহাদুরও তখন ছিলেন। আমরা যখন আসি তখন আমাদের দেখার জন্য প্রচুর দর্শক ছিল পথের দু'পাশে। সে জন্য একটি খোলা জিপে বিমানবন্দর থেকে আমাদের আনা হয়। বলা হয়েছিল আমরা যেন গাড়িতে দাঁড়ানো অবস্থায় থাকি, যাতে দর্শকরা আমাদের দেখতে পায়। খুব আদর করে দর্শকরা আমাদের কী কী যেন বলেছিল, কিন্তু বাংলা বুঝি না বলে তাদের কথা বুঝতে পারিনি। তবে অনুভব করেছিলাম তারা আদর এবং সম্মানের সঙ্গে কিছু একটা বলেছে।

■ *আপনি যখন তবলায় প্রথম হাত রাখেন তখন বয়স কত ছিল?*

আল্লারাখা : তখন ১০-১২ বছর হবে।

■ *আপনার বংশে আর কেউ তবলা বাজাতেন কি না?*

আল্লারাখা : আমিই প্রথম। আমার আগে চাচা, দাদা, পরদাদা-এরা সবাই ডোগরা রেজিমেন্টে চাকরি করতেন। আমি তো জম্মু-কাশ্মীরের লোক। আমার দাদা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং আমার বড় চাচাও। পুরো পরিবারই সামরিক বাহিনীতে ছিল।

■ *আপনার বাবার নাম কী?*

আল্লারাখা : আমার পিতার নাম হাশেম আলী।

■ *উনি কোন প্রফেশনে ছিলেন?*

আল্লারাখা : কী? প্রমোশন?

■ *না, পেশা।*

আল্লারাখা : না, উনি তবলা শুনতেন এবং ভালোবাসতেন। আমার বংশে আমারই প্রথম শখ হলো তবলা শেখার। কিন্তু আমাদের এলাকায় নাটক কোম্পানি এবং রাজলীলা করার দল অনেক আসত। ওর মধ্যে একজন তবলাবাদক ছিলেন, উনি ছিলেন খাঁ সাহেবের ছাত্র অর্থাৎ ওস্তাদ কাদের বক্সের ছাত্র ছিলেন, যার কাছে পরবর্তী সময়ে আমি তালিম পেয়েছি। উনি লাহোরের ছিলেন। প্রথমে ওনার বাজনা শুনে আমার শখ হলো তবলা শেখার। এবং উনি যেখানে যেখানে অনুষ্ঠান করতেন, আমি সেখানে সেখানে যেতাম। একসময় এ রকম হয়েছে—আমি ওনার বাজনা শোনার জন্য তাঁবুর ফাঁক দিয়ে অনুষ্ঠানে ঢুকে গিয়েছিলাম। কারণ, আমার কাছে পয়সা ছিল না। তো আয়োজকদের একজন আমাকে থাপ্পড় মারল। বলল, তুমি ভেতরে এলে কীভাবে? তোমার কাছে টিকিট আছে? পরে আমি ভাবলাম, আবার যদি কখনো অনুষ্ঠান দেখতে যাই তাহলে টিকিট কেটেই যাবো। ওই সময় যখনই অনুষ্ঠান হতো আমি তা শুনতে যেতাম। এবং আমি শুধু ওই তবলানেওয়াজকেই শুনতে যেতাম। ওই সময়কার গানবাজনা হতো সব ধ্রুপদাঙ্গের। সেই সময় থিয়েটারের কাজও রাগরাগিণী-নির্ভর ছিল। ওখান থেকেই আমার প্রেরণা। পনেরো বছর বয়সে শেখা শুরু করি। আমার পিতা বলতেন যদি কর তো ভালোভাবেই কর। নইলে ছেড়ে দাও। অন্য কাজ করো। সেনাবাহিনীতে যাও। কিন্তু সেনাবাহিনীতে আমাকে নেবে কীভাবে? কারণ, তখন আমার বয়সও কম, উচ্চতাও কম।

■ *আপনার এখন বয়স কত?*

আল্লারাখা : আটাত্তর বছর।

■ *আলী আকবর খাঁ সাহেব কি আপনার বড় না ছোট?*

আল্লারাখা : আলী আকবর আমার চার বছরের ছোট এবং রবিশঙ্কর আমার এক বছরের ছোট।

■ *আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের সঙ্গে আপনি কখনো সংগীত করেছেন কি?*

আল্লারাখা : বহুত দফা বাজায়া। আমাকে খুব পছন্দ করতেন, খুব আদর করতেন। কলকাতায় একসময় যুগলবন্দি করার একটা ব্যাপার ঘটল। যুগলবন্দি করতে হবে। আমি এর আগেও অল বেঙ্গল কনফারেন্সে এসেছিলাম ১৯৪৯ সালে। ওই সময় আল্লাহর ইচ্ছায় আমার প্রচুর সুনাম হলো বাংলা অঞ্চলে। বাংলায় যেখানে যেখানে আমি অনুষ্ঠান করতাম, সেখানেই লোক আমাকে কদর করত, পছন্দ করত। তো ওখানে কিছু লোক যারা তবলা বাজাত তাদের বলা হলো, আমার সঙ্গে যুগলবন্দি করার জন্য। ওরা বলেছে ঠিকই, কিন্তু সব ঘরের বাজনা তো এক না। আমার ঘরের বাজনা এক রকম, তাদের ঘরের বাজনা আরেক রকম। ওই সময় তো অনেক তৈরি হাত ছিল—যেমন শামতা প্রসাদ, কিষেন মহারাজ, আনোখেলাল, কেরামতউল্লাহ খাঁ। আরেকজন পাখোয়াজি ছিলেন, তার নাম লাল্লান বাবু। প্রথমে আমি বললাম যে বাজানোর আগে আমি ওদের সঙ্গে কথা বলতে চাই। তোমাদের দুঃখটা কী যে আমার সঙ্গে যুগলবন্দি করতে চাও? আমি কেরামতউল্লাহকে বললাম যে ভাই তুই এর মধ্যে আসিস না। ব্যাপারটা ঠিক না, আমার মনে হয় এর মধ্যে কোনো মতলব আছে।

এর আগেও যখন এসেছিলাম তখন কেরামতউল্লাহ খাঁ সাহেবের বাবা মসিদ খাঁ কেরামতউল্লাহকে বললেন যুগলবন্দি বাজাতে। তো আমি একটু ঘাবড়ে গিয়ে বললাম, কী অন্যায় করলাম যে যুগলবন্দি বাজাতে

হবে? কেরামতউল্লাহ তো বাজাবে না। কিন্তু ওর বাবা ওকে লাঠি নিয়ে তাড়া করলেন। না, তোকে বাজাতেই হবে। ওই সময় একজন সেতারিয়া ছিলেন, বেনারসে থাকতেন, তার নাম ছিল মুশতাক আলী খাঁ। মাঝখানে সেতার, একপাশে কেরামতউল্লাহ এবং আরেক পাশে আমি। ওই সময় হাত আমার বেশ তৈরি ছিল। যখনই আমার বাজনার পালা আসত তখনই দর্শক উৎফুল্লতা প্রকাশ করত। কেরামত খাঁ যখন বাজাত তখন দর্শকরা উল্লসিত হতো না। তখন মসিদ খাঁ সাহেব বললেন, কেরামতের মাইক্রোফোনটা ঠিক না। তখন আমি বললাম : ঠিক আছে, আমার মাইক্রোফোনটা কেরামতকে দাও। আমার হাত জোরালো ও তৈরি থাকায় তখন আমি দাপটের সঙ্গে 'সোম'-এ আসতাম। স্বভাবতই দর্শকরা আমাকে করতালি দিত। দর্শকরা চিৎকার করে তখন কেরামতকে বলল, তোমরা মাইক্রোফোন বদল করেছ, তবলাও বদল করেছ, কিন্তু হাত কেন বদল করছ না! এ রকমও হয়েছে জীবনে।

এরপরেও আবার সবাই যুগলবন্দি করার জন্য তৈরি হলো। কিন্তু আমার আয়োজককে আমি বললাম যে এই সবের কী দরকার? তখন আয়োজকরা বলল যে বাজাতে হবে। তো ওদের মধ্য থেকে আনোখেলাল বাজাতে রাজি হলো। কিন্তু দশ মিনিটের বেশি না। এই যুগলবন্দির মাঝখানে আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব সরোদ নিয়ে বসলেন। এসব তো হলো। আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের নাতি আশিষ খাঁ ওনার পেছনে বসল আর আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের এক পাশে আলী আকবর, আরেক পাশে রবিশঙ্কর বসলেন। তখন ওনারা এমন এক গৎ ধরলেন যেটার মুখ ছিল বারো মাত্রার। মনে হচ্ছিল যেন তিন তালের কম্পোজিশন। তখন আনোখেলাল ও শামতা প্রসাদ যথারীতি তিন তালেই বাজাচ্ছিলেন। তখন আমি হাতে তাল দিতে লাগলাম। তখন তারা বলল, তালি দিচ্ছেন কেন? আমি বললাম যে তালি এই জন্য দিচ্ছি, যাতে তোমরা 'সোম'টা বুঝতে পার। আমি আরও বললাম, আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব তাঁর গৎটা প্রথমে যে ছন্দে বাজালেন আমি

সেই ছন্দে বাজিয়ে পরে তিন তালে আসব। সামনে পাখোয়াজি লাল্লান বাবু বসেছিলেন, তিনি দারুণ খুশি হয়ে 'সোবহান আল্লাহ' বলে উঠলেন। কারণ, তিনি প্রথম থেকেই ব্যাপারটা বুঝতে পারছিলেন। তারপরে আমি বারো মাত্রায় সেই ছন্দটা বাজালাম।

একের পর এক বাজিয়ে শোনালাম। এই সমস্ত বাজানোর পর যেহেতু ছন্দটা তিন তালের ছিল কিন্তু গৎটা ছিল বারো মাত্রার, পরে আমি তিন তালের ছন্দটা বাজিয়ে শোনালাম। দর্শক-শ্রোতারা তখন খুব খুশি হলো। তখন আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব বললেন, চুপ থাকো, এত কথা বলো না। কারণ এখানকার লোক ভালো না। তখন আমি বললাম, আপনি নিশ্চিন্তে থাকেন। আমার কিছু হবে না। এরপর শামতা প্রসাদ দশ বারোজন গুন্ডা পাঠাল আমাকে মারার জন্য। আমি এসব কথা বলতে চাই না। উনি গুণী ছিলেন বটে, কিন্তু তার দিলটা সাফ ছিল না। তখন আমি বুঝলাম আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব আমাকে কেন কথা বলতে বারণ করেছিলেন। সে সময় কালীঘাটে আমার দশ-বারোজন ছাত্র ছিল। আমার ছাত্ররা আরও চল্লিশজন লোক নিয়ে এলো। শামতার এক একজন লোকের পেছনে আমার চারজন করে লোক পাহারা দিতে লাগল। তখন আমার সাগরেদরা বলল, আমার গুরু যদি বাজিয়ে ওদের সঙ্গে না পারেন তো ভালো, না পারলে কিছু করার নেই। চাকু মারামারির কী দরকার? সে সময় ওদের কিছু লোক ভেগে গেল। দু-একজনকে ধরে জিজ্ঞেস করলাম : তোমাদের কে পাঠিয়েছে? তখন ওরা শামতার নাম বলল। আমি তখন কাউকে ভয় পেতাম না। তখন আমি হোটেলে গেলাম এবং আমি নিচে দাঁড়িয়ে শামতা প্রসাদকে বললাম নিচে আস। তখন শামতা প্রসাদ ব্যাপারটা একটু পাশ-কেটে যাওয়ার চেষ্টা করল এবং আমতা আমতা করে বলল, না, না, আমি পাঠাইনি। তারপর এইভাবে ঝগড়াঝাঁটি শেষ হয়ে গেল।

কলকাতায় আমিই প্রথম মুখে তবলার বোল উচ্চারণ করে বলার প্রচলন শুরু করি। একসঙ্গে বাজানো এবং সেই বোলগুলো মুখে উচ্চারণ

করার ব্যাপারটি দর্শকদের অবাক করত। আমি যখনই কলকাতা আসতাম, তখন নতুন নতুন জিনিস বাজাতাম। ফলে সেখানকার শিক্ষার্থীরা বলত, গত বছর এক জিনিস বাজালেন, এবার অন্য জিনিস বাজাচ্ছেন। আমি বলতাম, প্রতিবছর তো আর একই জিনিস বাজানো যায় না। নতুন নতুন জিনিস তৈরি করতে হবে, বাজাতে হবে।

বাংলা, মহারাষ্ট্র এবং দক্ষিণ ভারত—এই তিনটিই হচ্ছে সংগীতের মূল ভিত্তিস্থান। এই তিনটি জায়গা থেকে সুরের সৃষ্টি এবং এসব জায়গায় বড় বড় গুণীদের জন্ম। যেমন, আলাউদ্দিন খাঁ, রবিশঙ্কর, তিমির বরণ, নিখিল ব্যানার্জি, পান্নালাল ঘোষ, হাফিজ আলী খাঁ, বড়ে গোলাম আলী খাঁ। এ রকম গুণী শিল্পী একশো দুইশো বছরেও জন্মায় না।

■ *হাফিজ আলী খাঁ সাহেবের সঙ্গে কি বাজিয়েছিলেন?*

আল্লারাখা : তিন-চারবার বাজিয়েছি। উপমহাদেশের এমন কোনো বড় শিল্পী নেই যার সঙ্গে আমি সংগীত করিনি—সে গায়কই হোক আর যন্ত্রীই হোক।

■ *ওস্তাদজি, আপনার ঘরানা কোনটি?*

আল্লারাখা : পাঞ্জাব ঘারানা। তবলার জন্মও কিন্তু পাঞ্জাব ঘরানা থেকে। আগে ছিল পাখোয়াজের প্রচলন। যেহেতু খেয়াল গানের সঙ্গে পাখোয়াজ মানানসই না, তাই পাখোয়াজকে ভাগ করে তবলা ও বায়ার উৎপত্তি। কোনো এক বইয়েও কিষেন মহারাজ বলেছেন যে তবলা যন্ত্রটি পাঞ্জাব ঘরানা থেকে এসেছে। হজরত আমির খসরু প্রচুর ছোট খেয়াল, বড় খেয়াল বানিয়েছেন। সেখানে তবলার ব্যবহার জোরালোভাবে শুরু হলো। উনি অনেক তালও সৃষ্টি করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে সাত মাত্রার ফরদস্ত, চাচর, সুলফাকতা, দীপচন্দী ইত্যাদি।

■ *১৯৫৮ সালে যখন এ দেশে প্রথম এসেছিলেন তখন কেমন লেগেছিল? আর এখন কেমন লাগছে?*

আল্লারাখা : তখন অনেক বুজুর্গ ছিলেন, ভালো সংগীতবোদ্ধা ছিলেন, এখনো আছেন। তবে কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে না একটু! এখন তো অনেক শিল্পী বেরিয়েছে। মডার্ন সিঙ্গার আছে, পপ সিঙ্গার আছে, মেশিনও তো এখন সিঙ্গার হয়ে গেছে। পপ তো আমি বুঝি না, হয়তো এটা ভালো জিনিস। তবে বিদেশি যারা নামকরা শিল্পীরা আছেন তারা আমাকে ইজ্জত করেন, যেমন ইহুদি মেনুহীন, ডেভিড হপার, জর্জ হ্যারিশন।

■ *ওস্তাদজি, ’৭১ সালে বাংলাদেশের সাহায্যার্থে জর্জ হ্যারিশন, রবিশঙ্কর, আলী আকবর খাঁ এবং আপনি আমেরিকায় যে অনুষ্ঠান করেছিলেন, সে সম্পর্কে কিছু বলুন।*

আল্লারাখা : আমেরিকার একটি বিশাল হলে ৪০ হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে আমরা অনুষ্ঠানটি করেছিলাম। তার সব টাকা আমরা বাংলাদেশে পাঠিয়েছিলাম। জানি না সেই টাকা বাংলাদেশ পেয়েছে কি না। যদি পেয়ে থাকে তাহলে আমি খুশি।

■ *আপনার প্রিয় তবলিয়া কে?*

আল্লারাখা : একজনকেই ভালো লাগত তিনি ওস্তাদ আহমেদ জান থেরকুয়া। নাথু খাঁকেও ভালো লাগে।

■ *জাকির হোসেনের এই অবস্থায় আসার পেছনে অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী খ্যাতির পেছনে আপনার কী ভূমিকা ছিল?*

আল্লারাখা : বাপ হিসেবে যে ভূমিকা থাকে। আমি তাকে কখনো মারধর করিনি। আমি তাকে কখনো গালিও দিইনি। বাজাতেও বলিনি। তবে মানসিকভাবে বীজ রোপণ করার চেষ্টা করেছি : তুমি কার ছেলে, তোমার কী হওয়া উচিত। একদিন বোম্বেতে এক অনুষ্ঠান শেষে বাসায় এসে দেখি জাকির বাসায় নেই। রেওয়াজ বন্ধ। খোঁজ নিয়ে দেখলাম সে

ক্রিকেট খেলতে সমুদ্রপাড়ে গেছে। তখন সেখানে গিয়ে তাকে একটি চড় মারি। জাকির স্তম্ভিত হয়ে গেল। জাকিরের মনে হলো, আমি তো কোনো অন্যায় করিনি, বাবা আমাকে কেন মারলেন? পরে ছেলেকে জড়িয়ে ধরে দুজনই কাঁদলাম। তখন বোধ হয় জাকির বুঝতে পারল কেন আমি তাকে মারলাম। কারণ, ক্রিকেট খেলা তার কাজ নয়। তার কাজ তবলা বাজানো। আঙ্গুলের কাজ। ক্রিকেট খেলতে গিয়ে হয়তো আঙ্গুল ভেঙ্গে যেতে পারে।

২০ নভেম্বর ১৯৯৬, বাংলাবাজার পত্রিকা

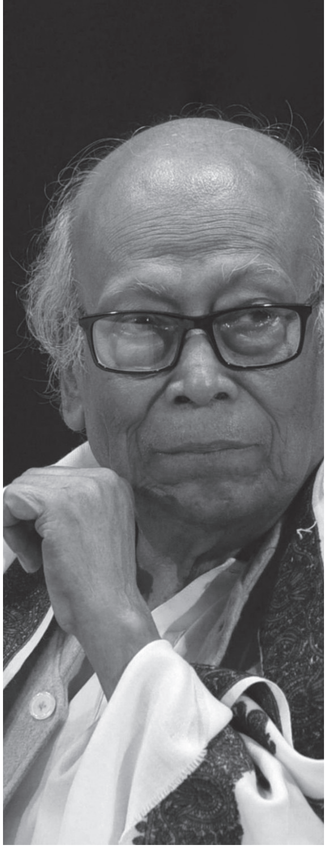

কোরআন শরিফে উটের উল্লেখ আছে, একাধিকবারই আছে

শঙ্খ ঘোষ (৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৩২—২১ এপ্রিল ২০২১) একজন ভারতীয় কবি এবং সাহিত্য সমালোচক ছিলেন। তিনি বর্তমান বাংলাদেশের তৎকালীন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির চাঁদপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন।

বাংলা কবিতার জগতে শঙ্খ ঘোষের অসামান্য অবদান রয়েছে। 'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে', 'বাবরের প্রার্থনা', 'এখন সময় নয়', 'নিহিত পাতালছায়া', 'আদিম লতাগুল্মময়', 'তুমি তেমন গৌরী নও', 'লাইনেই ছিলাম বাবা' তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। তিনি কবিতা ও গদ্যের সমন্বয় ঘটিয়েছেন আশ্চর্য দক্ষতায়। 'নিঃশব্দের তর্জনী', 'ছন্দের বারান্দা', 'শব্দ আর সত্য', 'কবিতার মুহূর্ত', 'লেখা যখন হয় না' ইত্যাদি তাঁর গদ্যগ্রন্থের অন্যতম। শিশু-কিশোরদের জন্যও রয়েছে তাঁর অজস্র রচনা। 'ছোট্ট একটা স্কুল', 'বড় হওয়া খুব ভুল', 'অল্পবয়স কল্পবয়স', 'শহরপথের ধুলো', 'আজকে আমার পরীক্ষা নেই' শঙ্খ ঘোষের আলোচিত শিশু-কিশোরগ্রন্থ। তিনি একজন বিশিষ্ট রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞও ছিলেন, 'ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ', 'নির্মাণ আর সৃষ্টি' সহ রয়েছে এ বিষয়ক আরও অনেক রচনা।

বাংলা সাহিত্য, ভারতীয় মনন ও মনীষা বিনির্মানে অসামান্য অবদানের জন্য তিনি 'পদ্মভূষণ', 'জ্ঞানপীঠ পুরস্কার', 'সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার' সহ অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হন।

২৭ মার্চ রাতে পৌঁছেছিলাম কলকাতায়, যোলো-সতেরো বছর পর। তবে সেবার ছিলাম একা, আর এবার দারাপুত্রপরিবারসহ। মূল লক্ষ্য অবশ্য দিল্লি যাওয়া, নিতান্তই ব্যক্তিগত কাজে। কিন্তু দিল্লি যাব অথচ কলকাতা হয়ে যাব না, তা কী করে হয়। আর কলকাতায় গিয়ে প্রিয় লেখক শঙ্খ ঘোষের সঙ্গে দেখা করব না, তা-ই বা কী করে ভাবি!।

২৭ তারিখ রাতেই কবি বন্ধু রাহুল পুরকায়স্থকে বললাম, শঙ্খদার সঙ্গে দেখা করতে চাই, তোমার কাছে তাঁর ফোন নাম্বার আছে? 'আছে,' কিন্তু পরক্ষণেই দ্বিধার মরচেধরা কণ্ঠে সে জানাল, 'কিন্তু পাবে কি না জানি না। তবু দিচ্ছি।'

ওর দ্বিধার কারণ বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমরা কি পাও

না কখনো?’ আমি তার কণ্ঠ থেকে মরচে সরাবার চেষ্টা করলাম।

‘পাই, তবে বহু চেষ্টার পর। আমি অবশ্য এখনকার কথা বলছি। উনি এখন নিজের বাসায় নেই, শুনেছি মেয়ের বাসায় আছেন। নিজের বাসায় থাকলে উনি ধরেন।’ রাহুল ধীরে ধীরে গোয়েন্দা গল্পের মতো রহস্যের জট খুলতে লাগল। ‘যদি তোমার ভাগ্য ভালো থাকে তাহলে পাবে।’ বুঝলাম রহস্যের জট খুললেও শেষ পর্যন্ত ভাগ্যের ওপর গিয়েই আমার আকাঙ্ক্ষার ভার ন্যাস্ত হচ্ছে।

পরের দিন ২৮, ২৯ এবং ৩০ তারিখ পর্যন্ত বহুবার চেষ্টা করেও কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। বুঝলাম, রাহুল মিথ্যে বলেনি। অথচ দেখা করাটা জরুরি। হাতে হাতে তাকে *আমার দক্ষিণে সূর্যোদয়* আর *আলাপচারিতা* বই দুটি পৌঁছে দেওয়ার তাগিদ। প্রথমটার ক্ষেত্রে তাগিদটা এই জন্য যে এই বইটির পেছনে তার কাছে আমার ঋণ, সেই ঋণের কথা রয়েছে ভূমিকায়। আর দ্বিতীয়টায় রয়েছে আমার নেয়া তার একটি সাক্ষাৎকার। সুতরাং এটিরও একটি কপি তার প্রাপ্য। অতএব সশরীরে তার হাতে বই দুটি দেওয়াই হবে সৌজন্যসম্মত।

দিল্লি যাওয়ার পথে তাকে পাওয়া গেল না বলে আমি অবশ্য হাল ছেড়ে দিইনি। কারণ ফেরার পথেও কল্লোলিনী কলকাতাকে রেখেছি। দিল্লি থেকে কলকাতায় ফিরেছিলাম ৩ এপ্রিল রাতের বেলা। রাতেই আবার ফোন করে না পেয়ে তরুণ কবি অরুনাভ রাহা রায়ের কাছ থেকে পাওয়া গেল আরেকটি নাম্বার, এটি তার স্ত্রীর। এই নাম্বারটি পেয়ে কিছুটা আশান্বিত হয়ে কল দিলেও শেষ পর্যন্ত সেই তিমিরেই পরে থাকতে হলো। তাহলে এ যাত্রায় আর দেখা হচ্ছে না শঙ্খদার সঙ্গে? কতসব প্রশ্ন জমে আছে, কত কী জানবার রয়ে গেছে তার কাছে, আর তার চেয়েও বড় কথা তাকে দেখতে ইচ্ছে করছিল খুব! দুই বাংলার জীবিত লেখকদের মধ্যে যে দুজনকে আমি সাহিত্যে প্রতিভা, পাণ্ডিত্য ও রুচির পরিচ্ছন্নতার জন্য শীর্ষস্থানীয় মনে করি তারা হলেন শঙ্খ ঘোষ ও অলোকরঞ্জণ দাশগুপ্ত।

এদের দুজনের প্রতি আমার শ্রদ্ধা সীমাহীন। শঙ্খদাকে না দেখেই দেশে ফিরতে হবে ভেবে বেশ খারাপই লাগছিল। এদিকে, ৫ তারিখেই আমাদের দেশে ফেরার তাড়া।

অতএব হাতে আছে মাত্র একটি দিন। ৪ তারিখে সকালবেলা নাশতা সেরে দুটো নাম্বারেই ফোন করলাম। অরুনাভ'র দেওয়া নাম্বারটায় আমাকে বিস্মিত করে এক নারীকণ্ঠের সাড়া পাওয়া গেল। বুঝলাম তিনি শঙ্খদার স্ত্রী। জিজ্ঞেস করলাম, 'এটা কি শঙ্খদার নাম্বার? আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি। আমি কি শঙ্খদার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?'

'একটু ধরুন, দিচ্ছি।' হাইকুর চেয়েও সংক্ষিপ্ত জবাবে তিনি জানালেন বহু প্রতীক্ষিত আশ্বাসের বিরাট আভাস।

শেষ পর্যন্ত পাওয়ার আনন্দে আমি রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছিলাম শঙ্খদার কণ্ঠের জন্য। মিনিট দেড়েক পরেই ভেসে এলো সেই কাঙ্ক্ষিত, প্রগাঢ়, কিন্তু ধীরস্থির কণ্ঠের আভা,

'হ্যাঁ।'

'জি শঙ্খদা, আমাকে হয়তো চিনবেন না। আমার নাম রাজু আলাউদ্দিন, আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই। আপনাকে দুটো বই পৌঁছে দেওয়ার তাগিদ রয়েছে। আমি কয়েক দিন ধরেই আপনার বাসার নম্বরে চেষ্টা করে যাচ্ছি, কিন্তু কোনোভাবেই পাচ্ছিলাম না।'

'আমি এক মাস ধরে মেয়ের বাসায় আছি। আগামীকাল নিজের বাসায় ফিরব।' মৃদুকণ্ঠে শঙ্খদা তুলে ধরলেন আমার চেষ্টার ব্যর্থতার কারণটি। 'আপনি যদি আসতে চান তাহলে কাল সকাল এগারোটায় আসতে পারেন।'

আগামীকাল যদিও আমার ফেরার দিন, তারপরেও আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম,

'অবশ্যই শঙ্খদা, আমি কালই চলে আসব।'

'আপনি কি উল্টোডাঙা চেনেন?'

'না, চিনি না, তবে চিনে নিতে পারব। আপনি যদি কাইন্ডলি ঠিকানাটা দেন।'

'লিখবার মতো হাতের কাছে কিছু আছে?'

'জি আছে।'

স্পষ্ট উচ্চারণে ঠিকানাটা দিয়ে দু-একটা রেফারেন্সও দিলেন, যাতে বাসাটি খুঁজে পেতে সুবিধা হয়।

পরের দিন এয়ার টিকিট বা ট্রেনের টিকিট পেতে দেরি হবে দেখে আমরা সড়কপথে বাংলাদেশে ফেরার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলাম, কারণ, ৫ তারিখের মধ্যে দেশে ফেরার তাড়া রয়েছে। শঙ্খদার সঙ্গে দেখা করার সময় নির্ধারিত হওয়ার সাফল্যে সেদিন ছেলেমেয়ে নিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়ালাম কলকাতার এখানে-সেখানে। সারা দিন ঘোরাঘুরি শেষে ক্লান্ত হয়ে রাতে পাথরের মতো ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই লক্ষ করলাম শরীর ভরে আছে ভৈরবী রাগে। কণ্ঠ থেকে অকারণেই বেরিয়ে আসছে সুরের মূর্ছনা। 'শরীর ছুঁয়ে শরীর ছেনে হৃদয় বলাৎকার/ করছে মহামান্য সুরের অখিল টঙ্কার।'

নাশতা সেরে কলকাতার এলিয়ট রোড থেকে সোজা বনগাঁ পর্যন্ত একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে সকাল সাড়ে দশটায় রওনা হয়েছিলাম আমরা। ড্রাইভারকে বললাম, 'উল্টোডাঙা হয়ে যেতে হবে কিন্তু; ওখানে আধা ঘণ্টা দেরি হবে, কোনো অসুবিধা নেই তো?' ভদ্রলোক আমাকে অবাক করে দিয়ে সহজেই রাজি হয়ে গেলেন। আমি তার জবাবে বেশ অবাক হয়েছিলাম। কারণ এই ক'দিনে দেখেছি এরা নানান ফিকির দেখিয়ে পয়সা খসাবার তালে থাকে; কিংবা নানা রকম অজুহাত দেখায়। সেই তুলনায় এই ভদ্রলোককে অনেক সহজ বলেই মনে হলো। এগারোটা-সোয়া এগারোটার মধ্যেই পৌঁছে গিয়েছিলাম তার বাসার কাছে। স্পষ্ট ঠিকানা দিলেও খুঁজে পেতে একটু সময় লেগেছিল। কারণ, একই উচ্চতার একই রঙের বহু ভবনের ভিড়ে কোনটা যে তার, সেটা কেবল ভবনের নাম ও নম্বর দিয়েই